...তথ্য ... ৩
...স্থ্য রক্ষায় স্যানিটেশন ... ৫
ভাইরাল হেপাটাইটিস ... ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE
FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৫ সংখ্যা ১

বৈশাখ ১৪০৩

প্রসবোত্তর সেবা

পারভীন এ. খানম

প্রসবোত্তর সেবা মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি অপরিহার্য অংশ। সাধারণত প্রসবের পর থেকে ৪২ দিন পর্যন্ত সময়কে "প্রসবোত্তর কাল" বলা হয়। এসময় মায়ের বিশেষ সেবা প্রয়োজন। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রসবোত্তর সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে প্রসবজনিত কারণে প্রতি এক হাজার জীবিত শিশুর জন্মের সময়ে ৫.৭ জন মা মারা যান। গর্ভ ও প্রসব-সংক্রান্ত জটিলতার জন্য এই অধিক সংখ্যক মা মারা যান—যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। মায়েদের মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ হলো: রক্তক্ষরণ, একলামশিয়া, সংক্রমণ, গর্ভপাত ও বিলম্বিত প্রসব। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ মায়েদের মৃত্যু ঘটে প্রসবকালীন বা প্রসবোত্তর সময় বিভিন্ন জটিলতার কারণে। আমাদের দেশে শতকরা ৯০ ভাগের বেশি শিশুর জন্ম হয় বাড়িতে, আত্মীয় বা দাইদের সাহায্যে। অনেক সময় এই আত্মীয় ও দাইদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে মায়েরা নানারকম সংক্রমণে আক্রান্ত হন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মৃত্যুও হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী ক্ষতিকর অভ্যাস ও খাদ্য সম্পর্কে নানারকম কুসংস্কারের ধারণা পাওয়া যায়—যা মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

মায়ের মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে আইসিডিডিআর,বি-এর এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রসবোত্তর ৪২ দিনের মধ্যে মায়েদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি এবং বিশেষ করে প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণও সংক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই এসময়ে সেবা গ্রহণের জন্য মাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং খাদ্য, বিশ্রাম ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান দিতে হবে।

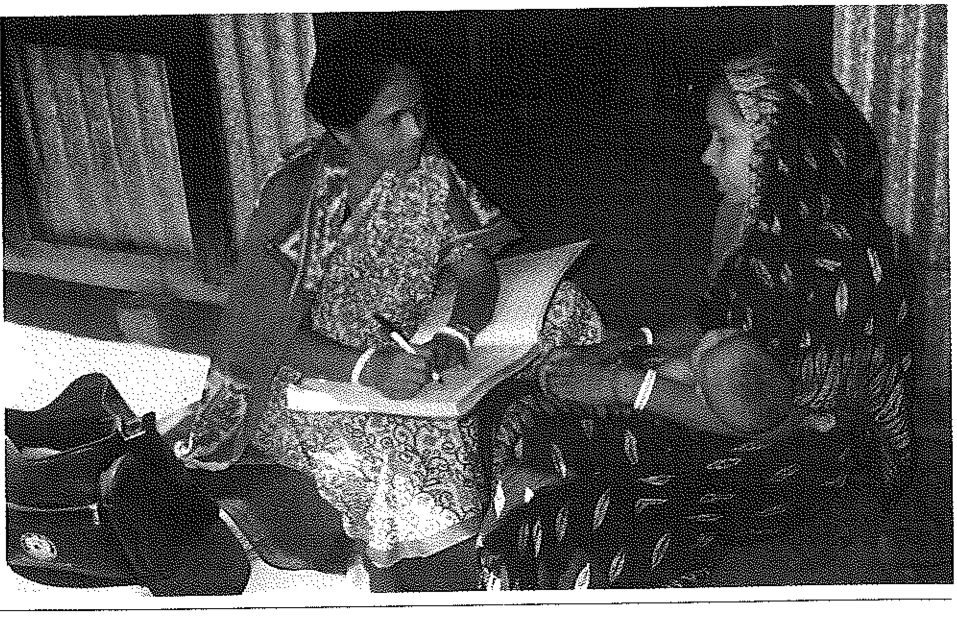

আমাদের দেশে নবজাতকদের মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এক-বছর বয়সের যেসব শিশু মৃত্যু বরণ করে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকে জন্মের ৪২ দিনের মধ্যে। এই অধিক হারে শিশুমৃত্যুর কারণসমূহ হলো জন্মকালীন আঘাত, ধনুষ্টংকার, নিউমোনিয়া বা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া, ইত্যাদি।

এই অতিরিক্ত মৃত্যুহার ছাড়াও প্রসবোত্তরকালে মা ও শিশু নানারকম অসুস্থতায় ভুগে থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শতকরা ৯০ ভাগ মায়েরা প্রসবোত্তর কোনো না কোনো অসুস্থতায় ভুগে থাকেন—যা উপযুক্ত সময় সঠিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে কমিয়ে আনা সম্ভব। সেজন্য মায়েদের প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করার জন্য সচেতন করে তুলতে হবে। প্রসবোত্তর সেবার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো: প্রসবোত্তর জটিলতাসমূহ, যেমন রক্তক্ষরণ, সংক্রমণ, ইত্যাদি চিহ্নিত করা এবং সময়মত সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা বা হাসপাতালে প্রেরণ করা।

আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গ্রাম-পর্যায় থেকে থানা-পর্যায় বা তারও উচ্চ পর্যায়ে প্রসবোত্তর সেবাদানের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এসব স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের হার অত্যন্ত কম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (FWC) ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২ থেকে ৫ ভাগ ব্যবহারকারী প্রসবোত্তর সেবার জন্য কল্যাণ কেন্দ্রের স্যাটেলাইট ক্লিনিক ব্যবহার করছেন। গবেষণায় আরো দেখা গিয়েছে, প্রসবোত্তর সেবা প্রদানের স্থান সম্পর্কে এমনকি অধিকাংশ সময় মায়েদের প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করা যে একান্ত প্রয়োজন এ-বিষয়ে অনেকে জানেন না। তাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহারের জন্য এবং মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মীদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। বর্তমানে

পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীরা প্রতি ২ মাস অন্তর-অন্তর প্রতিটি সক্ষম দম্পতিকে পরিদর্শন করে থাকেন। এসময়ে তাঁরা গর্ভবতী মায়েদের সনাক্তকরণ ও তাঁদের পরিচর্যার জন্য যেমন পরামর্শ দিয়ে থাকেন তেমনি প্রসবোত্তর যত্নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অবহিত এবং নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তাছাড়া প্রসবোত্তর সম্ভাব্য জটিলতাসমূহ সম্পর্কেও অবহিত করতে পারেন যে মাকে বাড়িতে অপেক্ষা না করে সাথেসাথে হাসপাতালে যেতে হবে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রসবোত্তর সেবা প্রদানের স্থান সম্পর্কে এমনকি অধিকাংশ সময় মায়েদের প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করা যে একান্ত প্রয়োজন এ-বিষয়ে অনেকে জানেন না। তাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহারের জন্য এবং মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মীদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে।

প্রসবোত্তর সেবা ও জটিলতার উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা যায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায়। তাই প্রতিটি প্রসূতি মাকে প্রসবোত্তর পরিদর্শনের সময় নিচে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং যেকোনো একটির উত্তর "হ্যাঁ" হলে তাকে নিকটস্থ প্যারামেডিক্সের নিকট বা হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

মায়ের জন্য

— প্রসবোত্তর মা তিনদিনের বেশি সময় জ্বরে ভুগছেন কিনা?
— শিশুর জন্মের পর অতিরিক্ত রক্তপাত হচ্ছে কিনা?
— তলপেটে বা মাথায় প্রচন্ড ব্যথা আছে কিনা?
— যোনিদ্বার দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত বা পুঁজ-মিশ্রিত স্রাব বের হয় কিনা?

শিশুর জন্য

— নাভি থেকে পুঁজ বা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে কিনা?
— দু'দিনের বেশি জ্বর আছে কিনা?
— প্রতিবার খাওয়ার পর বমি করে কিনা?
— বুকের দুধ চুষে খেতে পারছে কিনা?

তাছাড়া প্রসবোত্তর মাকে পরিদর্শনের সময় যে-যে বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে সেগুলো হলো :

— প্রসূতি মাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বিশ্রাম নিতে হবে।
— শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা মাকে বুঝাতে হবে এবং স্তনের যত্ন নিতে হবে।
— শিশুকে রোগ-প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।
— জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে।
— মা ও শিশু উভয়ের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে হবে।

মাকে প্রসবের পর যত্ন নেওয়ার জন্য পরিবারের সদস্য তথা স্বামী বা মুরুব্বিদের ভূমিকা অপরিসীম এবং এসম্পর্কে তাঁদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। মা যাতে পর্যাপ্ত খাবার খেতে ও বিশ্রাম নিতে পারেন সেজন্য সহায়তা করার জন্য পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রসবোত্তরকালে প্রতিটি মা যাতে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে FWV-এর নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া জটিলতা দেখা দেওয়ার সাথে-সাথেই নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

জেনে রাখা ভাল

(৮ এর পাতার পর)

* নাপিতের দোকানে গেলে নতুন ব্লেড ব্যবহার করছে কিনা তা দেখে নেবেন।
* দাঁতের চিকিৎসকের যন্ত্রপাতি ঠিকমত জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তবে দাঁতের অস্ত্রোপচার করাবেন।
* যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবেন।

যা যা করবেন না

* হাজামের কাছে বাচ্চাদের খত্না করাবেন না।
* ভাইরাল হেপাটাইটিসে আক্রান্ত রোগীর ব্যবহার্য জিনিষপত্র অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না।
* মাদকদ্রব্য ব্যবহার করবেন না।
* অবাধ যৌনাচার করবেন না।

যা যা খাবেন

* পানি ২০ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করবেন (টিউবওয়েলের পানি ফুটানোর প্রয়োজন নেই)।
* ফলমূল, সালাদের উপকরণসমূহ, ভাল করে ফুটানো পানিতে ধুয়ে নেবেন।

যা যা খাবেন না

* পুকুরের বা নদীর পানি।
* বাহিরের খোলা, বাসি খাবার।

ভাইরাল হেপাটাইটিসের রোগীদের জ্ঞাতব্য

যা যা করবেন

* চিকিৎসকের পরামর্শমত বিশ্রামে থাকবেন—যতদিন আপনার চিকিৎসক থাকতে বলেন।
* যতদূর সম্ভব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে আলাদা থাকবেন
* সম্ভব হলে পৃথক টয়লেট ব্যবহার করবেন।
* হেপাটাইটিস-বি হলে স্ত্রীসহবাসের সময় অবশ্যই 'কনডম' ব্যবহার করবেন।
* সুস্থ হবার পর প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শমত টিকা নেবেন
* মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখবেন। মনের সাহস হারাবেন না।
* আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন—এ বিশ্বাস সর্বদাই রাখবেন।

যা যা করবেন না

* সুস্থ হওয়ার পর অন্তত ৩ মাস পর্যন্ত শক্ত পরিশ্রমের কাজ করবেন না।
* ঝাড়-ফুঁক, মালা-পড়া, হাত-ধোয়া, ইত্যাদি করবেন না, কারণ এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
* হাতুড়ে ডাক্তার বা কবিরাজের চিকিৎসা করাবেন না।

যা যা খাবেন

* স্বাভাবিক খাবার খাবেন। রোগ মারাত্মক পর্যায়ে গেলে যা খাওয়া নিষেধ তা আপনার চিকিৎসক বলে দেবেন।
* হলুদ, মরিচ, পিঁয়াজ, তেল, লবণ, মাছ, মাংস, দুধ, শাক-সব্জি, ফলমূল সব খেতে পারবেন।
* চিকিৎসকের পরামর্শমত ঔষধ খাবেন।

যা যা খাবেন না

* পাতে আলগা লবণ।
* বিভিন্ন গাছের পাতার রস।
* চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত স্যালাইন নেবেন না।
* গ্লুকোজ, আখের রস, জাম্বুরার রস, ইত্যাদি খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই—বরং বেশি খেলে পেটে গ্যাস হয় এবং খাবারে অরূচি বাড়ে। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করা না হলে ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ডাঃ এম. মতিউর রহমান

চোখ-ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস

শওকত আলী তারা

'চোখ-ওঠা' একটি অত্যন্ত পরিচিত রোগ। চিকিৎসা শাস্ত্রে এ-রোগকে কনজাংটিভাইটিস বলা হয়। কনজাংটিভা হচ্ছে চক্ষু-গোলকের বাইরের স্তরের (Sclera) উপর একটি স্বচ্ছ আবরণ। চোখের পাতার উপর ভিতরের অংশ এবং চক্ষু-গোলকের বাইরের অংশটি এক প্রকার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এই ঝিল্লি বা পর্দাই হচ্ছে কনজাংটিভা। কনজাংটিভা-এর প্রদাহকেই চোখ-ওঠা বলা হয়।

সুস্থ চোখ

বিভিন্ন কারণে চোখে কনজাংটিভা-এর প্রদাহ হতে পারে। প্রধানত ভাইরাস সংক্রমণ, জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ এবং এলার্জিজনিত কারণে এ-রোগের সৃষ্টি হয়। তবে ভাইরাসজনিত সংক্রমণ শীত ঋতুর শেষে এবং বসন্তের শুরুতে বেশিরভাগ দেখা যায়, কারণ শীতের সময় বাতাসে জীবাণু কম থাকে, কিন্তু বসন্ত আসার সাথে-সাথে বাতাসে ও পরিবেশে এই জীবাণুগুলো বেড়ে যায়। কনজাংটিভাইটিস-এর কারণ হচ্ছে ভাইরাসজনিত সংক্রমণ।

ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস-এর উৎস ও উপসর্গ বা লক্ষণ ঃ চোখ-ওঠা রোগে বিশেষত ভাইরাসের আক্রমণে হঠাৎ করে চোখ লাল হয়ে যায়। প্রথমত এক চোখ, পরে দু'চোখই আক্রান্ত হয়। এতে চোখ লাল হয়ে খচ-খচ করে বা চুলকায়, পানি পড়ে ও চোখের পাতা সামান্য ফুলে যেতে পারে। চোখে কোনো পিচুটি (কেতুর) বা ময়লা হয় না; কিন্তু সামান্য আঠালো, পিচ্ছিল পদার্থ বের হতে পারে। দৃষ্টিশক্তি সাধারণত স্বাভাবিক থাকে। ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস-এর সংক্রমণ অতি অল্প সময়ে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা একই পেশায় নিযুক্ত জনাকীর্ণ জায়গায় এ-রোগ বেশি ছড়ায়। এই সংক্রামক রোগ অত্যন্ত মারাত্মক যা বাতাসে ছড়ায়, ফলে যে-কেউ আক্রান্ত হতে পারে। কখনো কখনো এ-রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আর বাংলাদেশে এই সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ খুব বেশি।

চোখ-ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস রোগ ছড়ায় সাধারণত আক্রান্ত রোগীর হাঁচি, সর্দি, কাশি, জোরে-কথা-বলা ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে। এছাড়া রোগীর ব্যবহৃত জিনিস যেগুলো রোগীর চোখ থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থের সাথে মিশে যাবার সম্ভাবনা আছে সেগুলোর মাধ্যমেও ছড়াতে পারে, কেননা এটি সম্পূর্ণ ছোঁয়াচে রোগ।

আক্রান্ত রোগীর জন্য করণীয়ঃ বাসায় বা বাড়িতে কারো ভাইরাসজনিত কনজাংটিভাইটিস হলে প্রথমেই তাকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলে কারো সংক্রমণ হলে তাকে সাময়িকভাবে ছুটি নিতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত যেকোনো জিনিস বিশেষত রুমাল, তোয়ালে বা গামছা আলাদা রাখতে হবে—যাতে কোনো ধরনের নিঃসৃত আঠালো, পিচ্ছিল পদার্থ জমতে না পারে। এজন্য নরমাল স্যালাইন অথবা এর অভাবে পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ পরিস্কার রাখতে হবে। চোখে খুব বেশি নিঃসৃত আঠালো পদার্থ জমে চোখ খুলতে কিংবা তাকাতে অসুবিধা হলে হালকা গরম পানি ব্যবহার করা ভাল। প্রয়োজনে তুলা ভিজিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে হবে।

চোখের যন্ত্রণা এবং তাকানোর সুবিধার্থে কালো কাঁচের চশমা (গগল্স) ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া চোখের যন্ত্রণা ও চুলকানি প্রশমিত করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এ্যান্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট, কোনো এ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ, যেমন ক্লোরামফেনিকল, ফোঁটা-আকারে চোখে দিনে ৬ বার এবং টেরামাইসিন মলম রাতে ১ বার দেওয়া যায়। অনেকে সামাজিক কুসংস্কারে প্ররোচিত হয়ে চোখে শামুকের রস, পাতার রস—বিশেষ করে তুলশী পাতার রস বা গোলাপ পানি ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো কখনো ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া চোখে কোনো প্রকার স্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না, কেননা স্টেরয়েড ব্যবহারে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এতে কর্ণিয়ার আলসার হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হতে পারে।

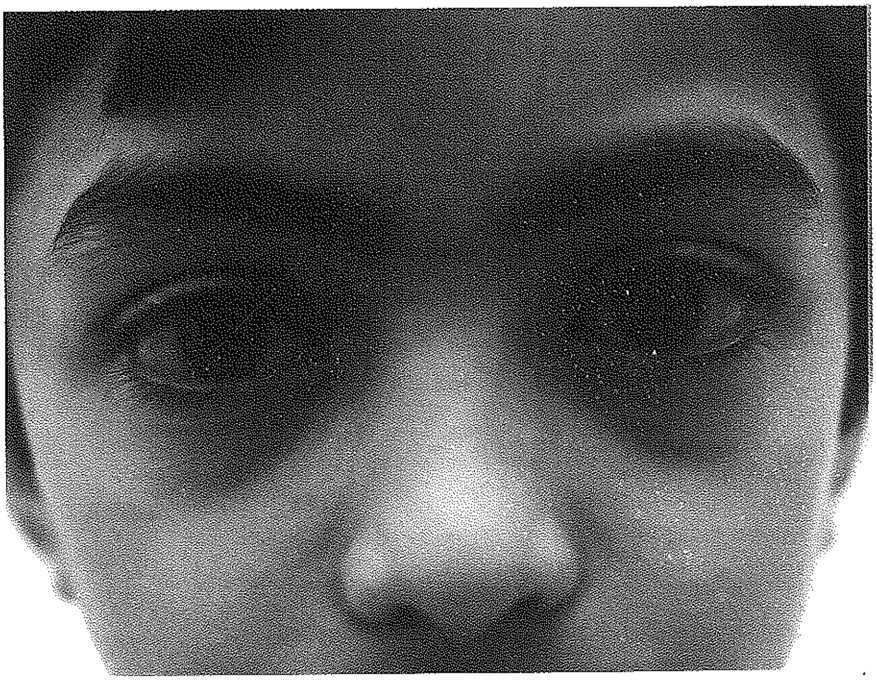

আক্রান্ত চোখ

দু'দিনের মধ্যে চোখের অবস্থার উন্নতি না হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে ভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে, চিকিৎসকদের ধারণা এটি এডিনোভাইরাস—চোখের মণিতে এর ক্ষত সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। চোখের সঠিক সমস্যা নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারের কাছে গেলে তিনিই সঠিকভাবে বলে দিবেন কি ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে চোখ-ওঠাঃ ভাইরাসজনিত সংক্রমণ ও ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাকটেরিয়ায় সংক্রমিত হলে চোখ-ওঠার সব উপসর্গই থাকবে। তবে সবচেয়ে যে উপসর্গটির প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হলো: চোখে ময়লা বা পিচুটি জমে কিনা। পিচুটি জমলে চোখের পাতা কম ফুলে, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে ফুলতেও পারে। সকালে ঘুম থেকে জেগে-ওঠার পর চোখের পাতা দু'টি একটি অপরটির সঙ্গে লেগে আটকে থাকে, টেনে বা পানি দিয়ে ভিজিয়ে আস্তে-আস্তে খুলতে হয়। চোখে পিচুটি হওয়া ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ এবং জরুরীভাবে চিকিৎসা না করালে চোখের মণিতেও ঘা হতে পারে। তাই এ-রোগে সাবধানতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরী।

আক্রান্ত রোগীর জন্য করণীয়ঃ চোখে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হয়ে কনজাংটিভাইটিস হলে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে: কোনো অবস্থায় চোখ হাত দিয়ে রগড়ানো বা কচলানো যাবে না। চোখে হাত দিলে সঙ্গে-সঙ্গে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। চোখ পরিষ্কার করতে হলে বিশুদ্ধ পানিতে তুলা ভিজিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। রোগীর ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিস বিশেষত তোয়ালে/গামছা, গায়ের কাপড়, রুমাল আলাদা রাখতে হবে। চোখে ক্লোরামফেনিকল বা জেনটামাইসিনজাতীয় চোখের ড্রপ দিনে ৫/৬ বার ব্যবহার করা যায়। রাতে যেকোনো এ্যান্টিবায়োটিক চোখের মলম (Antibiotic eye ointment) ব্যবহার করা যায়। তবে

চোখে হাত দিলে সঙ্গেসঙ্গে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। চোখ পরিষ্কার করতে হলে বিশুদ্ধ পানিতে তুলা ভিজিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। রোগীর ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিস বিশেষত তোয়ালে/গামছা, গায়ের কাপড়, রুমাল আলাদা রাখতে হবে। চোখে ক্লোরামফেনিকল বা জেনটামাইসিনজাতীয় চোখের ড্রপ দিনে ৫/৬ বার ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহারের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হলেও চোখে স্টেরয়েড ব্যবহার করা উচিত নয় এবং ব্যবহার করলে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। দু'তিন দিনের মধ্যে রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে অবশ্যই চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এলার্জিজনিত কারণে চোখ-ওঠা ঃ চোখে ব্যবহার করা হয় এমন যেকোনো বস্তু থেকে এলার্জি হবার সম্ভাবনা থাকে। এসব ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে কসমেটিকস্, কাজল, সুরমা, ইত্যাদি। তবে বাতাসে ভাসমান ফুলের রেণু বা খাদ্য থেকেও এলার্জি হতে পারে। এলার্জিজনিত সংক্রমণ হলে চোখে কোনো পিচুটি বা ময়লা জমে না এবং চোখের পাতাও আটকে থাকে না। কিন্তু চোখ প্রচন্ড চুলকায় এবং চুলকাতে-চুলকাতে লাল হয়ে ওঠে। চুলকানি ভাবটা দিনে-রাতে যেকোনো সময় হতে পারে। এতে চোখ দিয়ে সামান্য পরিমাণে পানি পড়তে পারে। তবে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক থাকে।

আক্রান্ত রোগীর জন্য করণীয়ঃ চোখে এলার্জি হলে প্রাথমিক অবস্থায় কুসুম-গরম পানিতে চোখ ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে কুসুম-গরম পানিতে তুলা ভিজিয়ে চোখের পাতার উপর সেক দেওয়া যেতে পারে। যদি বুঝা যায় কি কারণে এলার্জি হচ্ছে তবে সে কারণ থেকে নিজেকে মুক্ত

কনজাংটিভাইটিস-এর কারণে সাধারণত অন্ধত্ব হয় না। তবে কুসংস্কারের জন্য আগেই বলা হয়েছে যে অনেকে চোখে বিভিন্ন গাছ/পাতার রস, শামুকের রস, ফলের রস বা অন্য কোনো কিছু চোখে ব্যবহার করে থাকেন। এধরনের হাতুড়ে চিকিৎসায় চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি চোখ চিরতরে অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

রাখা উচিত। যদি ২/৩ দিনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হয় তবে অবশ্যই চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তারগণ এ-রোগের জন্য এ্যান্টিহিস্টামিনজাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকেন। অনেক সময় চক্ষু বিশেষজ্ঞগণকে স্টেরয়েড দিতে দেখা যায়। চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই স্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না।

সাধারণ সতর্কতাঃ মনে রাখতে হবে, দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর এ-রোগের সংক্রমণ নির্ভর করে না, কিন্তু রোগের তীব্রতা, স্থায়ীত্ব ইত্যাদি প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যেমন একজন সুস্থ মানুষ (বা যার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি আছে) তার অল্প সময়েই নিরাময় ঘটতে পারে, নূন্যতম ৩ দিনের মধ্যেই। আবার যার সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হবে এবং যার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তার বেশি সময় (৭ দিন) লাগতে পারে।

এ-রোগের কোনো টিকা বা প্রতিষেধক নেই। খাবার গ্রহণেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, অর্থাৎ স্বাভাবিক সবকিছুই খাওয়া যাবে। কনজাংটিভাইটিস-এর কারণে সাধারণত অন্ধত্ব হয় না। তবে কুসংস্কারের জন্য আগেই বলা হয়েছে যে অনেকে চোখে বিভিন্ন গাছ/পাতার রস, শামুকের রস, ফলের রস বা অন্য কোনো কিছু চোখে ব্যবহার করে থাকেন। এধরনের হাতুড়ে চিকিৎসায় চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি চোখ চিরতরে অন্ধও হয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় চোখের ময়লা পরিস্কার করলে, নিজে ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে এবং চোখে একটি এ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ ব্যবহার করলে এ-রোগ ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। তবে তাড়াতাড়ি আরোগ্য না হলে বা চোখের অবস্থার অবনতি হলে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই চোখ-ওঠা রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এর প্রধান কারণ সংক্রামক রোগ সম্পর্কে অসচেতনতা বা অজ্ঞতা। বিভিন্ন সংক্রামক রোগে এদেশের হাজার হাজার মানুষ প্রতিবছরই আক্রান্ত হচ্ছে। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ-সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি এসব রোগের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী।

স্বাস্থ্য রক্ষায় স্যানিটেশন

মোঃ জসীম উদ্দিন

বাংলাদেশে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের উন্নতি হলেও ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার আকাংখিতভাবে কমে নি। বিশেষজ্ঞদের মতে এখনও বাংলাদেশে যেসমস্ত রোগ হয় সেগুলোর শতকরা ৮০ ভাগই পানি বা মলবাহিত। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল, নলকূপের পানি ব্যবহার করলেই পানিবাহিত সব রকম রোগ নির্মূল করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা-পরিচালিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, কেবল নিরাপদ পানি ব্যবহার করলেই হবে না, বরং এর সাথে ১০০% পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পায়খানা বা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশে গ্রামের অনেক বাড়িতেই পায়খানা নেই। সরকারি হিসাব মতে এপর্যন্ত গ্রামের মাত্র শতকরা ১২ থেকে ১৫ জন লোক স্বাস্থ্যগত জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া গ্রামের অনেক অবস্থাপন্ন বাড়িতেও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই— এমনকি পায়খানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অনেকের ধারণা নেই। শহরাঞ্চলে বস্তির অবস্থা আরো খারাপ। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) – পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মহানগরী ঢাকায় বর্তমানে মোট প্রায় ৬০ লক্ষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বস্তি, ফুটপাত, ইত্যাদি জায়গায় বাস করে। বস্তিগুলোর শতকরা ৮ ভাগ পরিবারে নিজস্ব পায়খানা রয়েছে, ৫ ভাগ পরিবারের পায়খানা ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই এবং বাকি পরিবারগুলোর মধ্যে গড়ে ৪০টি পরিবার একটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে থাকে। গ্রাম এলাকার মত শহরাঞ্চলে পরিত্যক্ত জমি নেই বলে বস্তিবাসীরা পয়ঃপ্রণালী ড্রেন, রেল-লাইন, ইত্যাদি জায়গায় মলত্যাগ করে থাকে। বাংলাদেশের মাঠে, ঘাটে, রেল-লাইন, সোয়ারেজ ড্রেন, নদী-নালা ও উন্মুক্ত স্থানে ২৫ হাজার মেট্রিক টন মল ত্যাগ করা হয়।

উন্মুক্ত স্থানে যত্র-তত্র মলত্যাগের কারণে দেশব্যাপী পানি দূষণ হয় যার ফলে কৃমি ও ডায়রিয়াজনিত রোগ বিস্তার লাভ করে। সরকারি হিসাব মতে প্রতি বছর ২ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি শিশু মারা যায় ডায়রিয়ায়। এর মূল কারণ হলো জনগণের স্যানিটেশন সম্পর্কে উদাসীনতা। এবিষয়ে সচেতনতা নেই বলেই আজ আমরা এরূপ স্বাস্থ্য সমস্যায় ভূগছি। অথচ এবিষয়ে একটু সচেতন হলেই আমরা এজাতীয় মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারি।

স্যানিটেশন কী ও কেন?

স্যানিটেশন হলো স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সহায়ক কিছু কাজ। অন্য কথায়, স্যানিটেশন হলো:

* পানি ও মলবাহিত রোগ থেকে বেঁচে থাকা— যেমন ডায়রিয়া, কৃমি, ইত্যাদি।
* নিরাপদ পানি পান করা ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা।
* ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
* স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অল্প খরচে তৈরি করা যায় এমন দু'টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার বিবরণ ও ছবি দেওয়া হলো। এর যেকোনো একটি সহজেই তৈরি করা যায়।

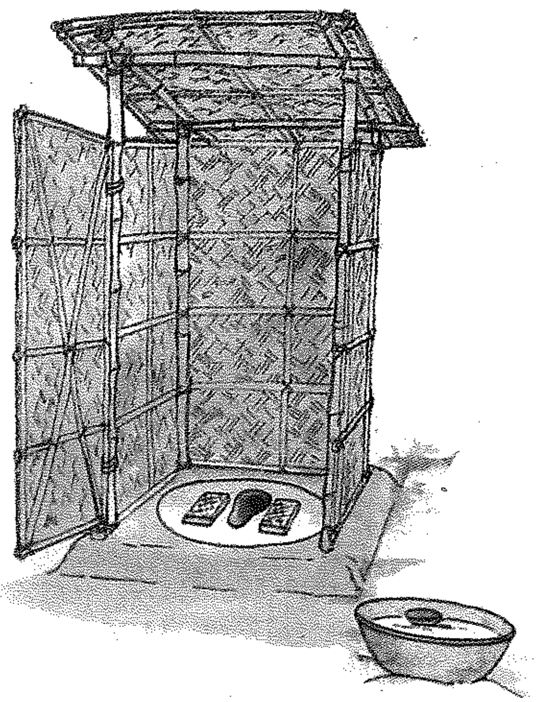

জলাবদ্ধ পায়খানা

জলাবদ্ধ পায়খানা

০ জলাবদ্ধ পায়খানা এমন একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা যা

ক. প্যান দিয়ে তৈরি করা হয় ও যাতে সব সময় পানি আটকে থাকে।

খ. স্যানিটারী বা স্বাস্থ্যসম্মত।

গ. মশা-মাছি ঢুকতে পারে না এমন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয়।

ঘ. গন্ধ ছড়ায় না।

এর ব্যবহারে সুবিধা হচ্ছে

ক. বসত বাড়ির কাছাকাছি বসানো যায়

খ. তৈরি করতে কম খরচ লাগে

গ. দুর্গন্ধ ছড়ায় না

ঘ. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে ও সহজে যেকোনো বয়সের পুরুষ/মহিলারা ব্যবহার করতে সক্ষম।

জলাবদ্ধ পায়খানা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর স্থানীয় অফিস বা বেসরকারি উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

জলাবদ্ধ পায়খানা বসত বাড়ির উঁচু শক্ত মাটিতে, বালি অথবা কাদা-মাটি এলাকায় অথবা টিউবওয়েল, কুয়া ও পুকুর থেকে ১০ মিটার বা ২১ হাত দূরে বসানো যেতে পারে।

স্ল্যাব ও রিং জলাবদ্ধ পায়খানায় কীভাবে বসাবেনঃ রিং থেকে সামান্য দূরে ছোট ব্যাসের গর্ত করতে হবে, তবে গর্তের গভীরতা কমপক্ষে ২ মিটার বা ৪ হাত হতে হবে।

গর্তের উপর রিং বসিয়ে রিং-এর উপর স্ল্যাব ঠিকমত বসাতে হবে। নরম মাটি হলে পার যাতে ভেঙ্গে না যায় সেজন্য গর্তের ভিতর খাঁচ বসাতে হবে।

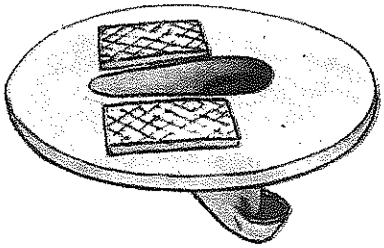

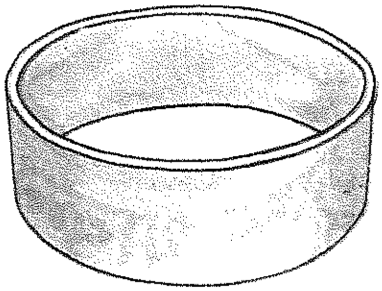

জলাবদ্ধ পায়খানা কীভাবে ব্যবহার করবেন

— পানি-খরচ ও পায়খানা থেকে বের হয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্য কাছাকাছি পানি-ভর্তি বালতি অথবা মটকা এবং সাবান/ছাই রাখুন।

— পায়খানা ব্যবহারের আগে ও পরে সামান্য পানি প্যানে ঢেলে দিন। এতে প্যানে মল লেগে থাকবে না।

— সব সময় বদনা বা লোটা ডান হাত দিয়ে ধরার অভ্যাস করুন এবং শিশুদের মলও পায়খানায় ফেলুন। তাছাড়া ছোট বয়স থেকে শিশুদের পায়খানা ব্যবহার করা শিখতে সাহায্য করুন।

— পায়খানায় কোনো অবস্থাতেই কুলুপ ফেলা যাবে না। কুলুপ ফেলার জন্য পায়খানার এক কোণায় একটি মাটির পাত্র রেখে দিন। পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে ব্যবহৃত কুলুপ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলুন।

— কোনো অবস্থাতেই পায়খানার গর্তে লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে খোঁচা দিবেন না। জলাবদ্ধ অংশ (যেখানে পানি আছে) ভেঙ্গে গেলে এই পায়খানা আর স্বাস্থ্যসম্মত থাকবে না। তখন তাতে মশা-মাছি ঢুকবে ও দুর্গন্ধ বের হবে।

গর্ত-পায়খানা

গর্ত পায়খানা মাটিতে গর্ত করে বানানো হয় যা নিজে-নিজে খুব সহজে তৈরি করা যায় এবং যা সহজেই পাওয়া যায় এমন উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। গর্ত-পায়খানা দুর্গন্ধ ছড়ায় না।

গর্ত-পায়খানা ব্যবহারে সুবিধা ঃ বসত বাড়ির কাছাকাছি বসানো যায় এবং একেবারে অল্প খরচে ও অনায়াসে এই পায়খানা তৈরি করা যায়।

তাছাড়া এধরনের পায়খানা পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে।

গর্ত-পায়খানা কোথায় বসাবেনঃ বসত বাড়ির উঁচু শক্ত মাটিতে, বালি অথবা কাদা-মাটি এলাকায় এবং টিউবওয়েল, কুয়া ও পুকুর থেকে ১০ মিটার বা ২১ হাত দূরে গর্ত পায়খানা তৈরি করা যায়।

গর্ত-পায়খানা কীভাবে তৈরি করবেন ঃ গর্তের ব্যাস ৭০ সেন্টিমিটার অথবা প্রায় দেড় হাত চওড়া এবং গর্তের গভীরতা ২ মিটার বা ৪ হাত করতে হবে।

— নরম মাটি হলে পার যাতে ভেঙ্গে না যায় সেজন্য গর্তের ভিতর খাঁচ বসাতে হবে। তাছাড়া গর্তের চারদিকে উঁচু-করে মাটি দিয়ে ভিটি তৈরি করতে হবে।

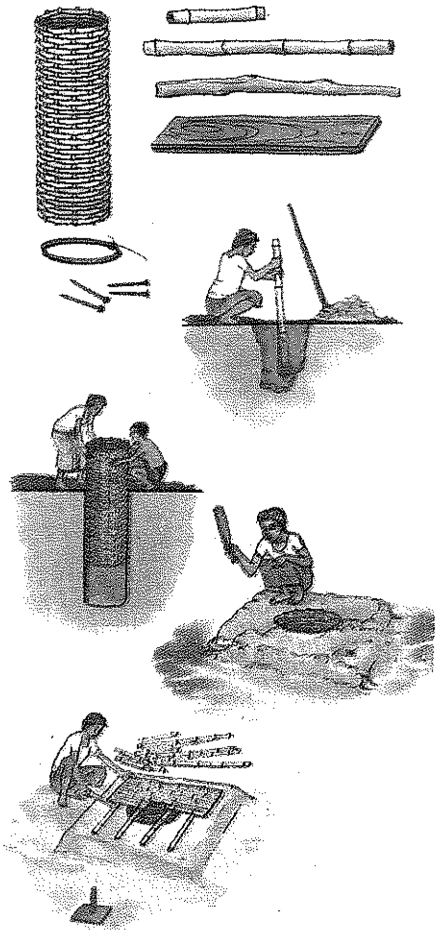

— বাঁশ/কাঠ/গাছের ডাল দিয়ে পাটাতন বা মাচান তৈরি করতে হবে। পাটাতন বা মাচানের মাঝখানে ২০ সেন্টিমিটার বা ১০ আঙ্গুল চওড়া এবং ৩০ সেন্টিমিটার বা ১৫ আঙ্গুল লম্বা ফাঁক রাখতে হবে। এই পাটাতন বা মাচান গর্তের উপর এমনভাবে বসাতে হবে যাতে ফাঁকটি গর্তের মাঝখানে বসে। ফাঁকটি ঢেকে রাখার জন্য হাতলসহ ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে।

— বাঁশের কঞ্চি/পাটখড়ি, ইত্যাদি দিয়ে একটি দরজা রেখে বেড়া দিয়ে দিতে হবে।

কীভাবে গর্ত-পায়খানা ব্যবহার করবেন

— পানি-খরচ ও পায়খানা থেকে বের হয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্য কাছাকাছি পানি-ভর্তি বালতি অথবা মটকা এবং সাবান/ছাই রাখতে হবে। পায়খানা ব্যবহার করার পর ঢাকনা দিয়ে পায়খানা ঢেকে দিতে হবে।

— মল ত্যাগ করার পর প্রথমে বাম হাত ও পরে ডান হাত সাবান বা ছাই দিয়ে পরিস্কার করে ধুয়ে ফেলুন। পরে দু'হাত ভাল করে কচলিয়ে ধুয়ে ফেলুন, প্রয়োজনে পা ধোবেন।

— কুলুপ সরাসরি গর্তে ফেলুন।
— শিশুদের মলও পায়খানায় ফেলুন।
— খালি-পায়ে পায়খানায় যাবেন না, কারণ এতে কৃমি পা দিয়ে শরীরে ঢুকে যেতে পারে।

পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণ

— জলাবদ্ধ পায়খানার স্ল্যাব এবং গর্ত-পায়খানার পাটাতন বা মাঁচা পরিস্কার রাখুন।
— পায়খানার প্যানে কাপড়, কাগজ, আবর্জনা বা কুলুপ ফেলবেন না।
— জলাবদ্ধ পায়খানার প্যানে মল জমে থাকলে জোরে পানি ঢালুন। এতেও কাজ না হলে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসে যোগাযোগ করুন।
— পায়খানার গর্তের কাছে বড় গাছের চারা জন্মালে তা সরিয়ে ফেলুন।
— ভিটি, বেড়া ও চাল প্রয়োজনে মেরামত করুন।
— রোজ ঝাড়ু দিয়ে পায়খানা পরিস্কার করুন।
— মল স্ল্যাব বা রিং এবং পাটাতন বা মাঁচানের কাছাকাছি আসার আগেই পায়খানা ব্যবহার বন্ধ করুন।

পায়খানা ভরে গেলে কী করবেন

— নতুন আরো একটি গর্ত করুন এবং আগের নিয়মে আরো একটি পায়খানা তৈরি করুন।
— নতুন পায়খানাটি আগের পায়খানা থেকে ২ মিটার বা ৪ হাত দূরে তৈরি করুন। মনে রাখবেন, জলাবদ্ধ পায়খানা পুনরায় তৈরি করতে নতুন রিং এবং স্ল্যাব-এর প্রয়োজন নেই। আগের রিং ও স্ল্যাব দিয়েই তা তৈরি করা যায়।
— আগের গর্তটি সম্পূর্ণভাবে মাটি বা ছাই দিয়ে ঢেকে দিন।
— মাটি-চাপা মল দেড় বছর পর সার হয়ে যায়—যা ফসল বা শাক-সব্জি উৎপাদনে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্যানিটেশনে মায়েদের ভূমিকা

স্যানিটেশন ব্যবস্থায় মায়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি পরিবারে মায়েরাই দেখেন। একটি শিশুর পরিচ্ছন্নতার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব মায়ের। খাওয়া, গোসল, কাপড়-চোপড় ও বিছানা পরিস্কার সব কাজ মায়েরাই করেন।। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটি এমন যা শিখে নিতে হয় এবং অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। একবার অভ্যাসে পরিণত হলে তা ছাড়া যায় না এবং তা বংশানুক্রমে চলে। প্রতিটি বাড়িতে সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে কর্তা ব্যক্তিটি যেমন বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরির ব্যবস্থা নিবেন, তেমনি মা শিশুকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান দিবেন; মলত্যাগের পর সাবান অথবা ছাই দিয়ে পরিস্কারভাবে হাত ধোয়ার জন্য শিশুকে অভ্যাস করাবেন। একটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত, আদর্শ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে মায়ের অবদানই সবচেয়ে বেশি হতে পারে।

স্যানিটেশনের অভাবে শিশু ডায়রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে, কৃমিতে ভোগে। অনেক সময় দেখা যায় মা নিজেও শিশুর মল-মূত্র ধুয়ে হাত ভালভাবে পরিস্কার না করেই রান্নাঘরের সমস্ত কাজ সেরে নেন। এতে মল-মূত্র বাহিত জীবাণু খাদ্যদ্রব্যে মিশে যায়।

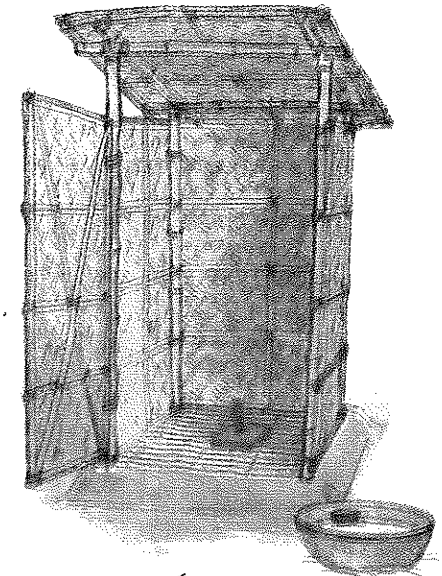

গর্ত পায়খানা

মা যদি একটু সচেতন হন তবে পরিবারের শিশুসহ অন্য সদস্যরাও ডায়রিয়া, কৃমি, ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তাই মায়েদের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের পরিচর্যায় আরো সজাগ হন এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে আরো মনোযোগী হন। রান্না-বান্নার আগে, শিশু ও পরিবারের অন্য সদস্যগণের খাওয়ানোর আগে যেন ভাল করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নেন। মা-ই সন্তানের প্রথম শিক্ষক। মায়েরা সচেতন হলে ঘরে-ঘরে আর এত শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটবে না।

কতিপয় উপদেশ

* পবিত্র কোরান-এ আছে আল্লাহ তাকেই ভালবাসেন যিনি নিজেকে পাক ও পবিত্র রাখেন। সুতরাং পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য ও নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করুন এবং পায়খানা ও প্রস্রাবের পর শরীরের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং হাত ভালভাবে পরিস্কার করুন।
* ডায়রিয়া থেকে বাঁচার জন্য স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করুন।
* মায়েরা স্বাস্থ্য রক্ষার্থে মল ত্যাগের পরে ও রান্না করার আগে সাবান বা ছাই এবং প্রচুর পানি দিয়ে ভাল করে দু'হাত ধুয়ে নিন।
* নদী, পুকুর, নালা, টিউবওয়েল বা পানির কল অর্থাৎ পানির উৎসের কাছাকাছি পায়খানা তৈরি করবেন না।
* পায়খানার দুর্গন্ধ দূর করুন এবং স্যানিটারী পায়খানা সব সময় পরিস্কার রাখুন।

সরকার ঘোষিত "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং আমাদের নিজেদের স্বার্থে আসুন আমরা সবাই মিলে অঙ্গীকার করি :

— প্রত্যেকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করব এবং পায়খানা পরিস্কার রাখবো।
— পরিবারের সকলকে ও প্রতিবেশীদের সকলকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে সাহায্য করব।
— যথাসময়ে পায়খানা মেরামত করব।
— শিশুদের ছোটবেলা থেকেই পায়খানা ব্যবহার করতে শিক্ষা দিব।

জেনে রাখা ভাল

ভাইরাল হেপাটাইটিস

ভাইরাল হেপাটাইটিস একটি সংক্রামক রোগ। নাম শুনেই বুঝা যায় এটা ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণত লোকে বলে জন্ডিস হয়েছে। এ-কথাটা ঠিক নয়। আসলে জন্ডিস রোগের নাম নয়, রোগের লক্ষণ। ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগ হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জন্ডিস (চোখ হলুদে-হয়ে-যাওয়ার লক্ষণ) দেখা যায়। জন্ডিস ছাড়াও ভাইরাল হেপাটাইটিস হতে পারে, কারণ রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে যখন ২ মিঃ গ্রাঃ (৩৪ মাইক্রোমোল লিঃ) বা তার বেশি হয় কেবল তখন জন্ডিস (চোখ-হলুদে) বুঝা যায়।

হেপাটাইটিস—এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যমে এ-রোগ হয় এবং সে-অনুসারে এ-রোগের নামকরণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে হেপাটাইটিস-বি সবচেয়ে মারাত্মক। তবে আতংকিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা এ-রোগের চিকিৎসা আছে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ-রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ভাইরাস কীভাবে শরীরে প্রবেশ করে

* হেপাটাইটিস-এ এবং হেপাটাইটিস-ই মুখ দিয়ে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে — পানি এবং খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে।
* হেপাটাইটিস-বি জীবাণু-সংক্রমিত সিরিঞ্জ, সুঁচ, ক্ষুর, ব্লেড, চাকু, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার (বিশেষ করে দাঁতের), রক্ত পরিসঞ্চালন, রক্তজাত ঔষধের ব্যবহার, যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।

ভাইরাল হেপাটাইটিস প্রতিরোধের উপায়

যা যা করবেন

* ভাইরাল হেপাটাইটিসের টিকা নেবেন। সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবেন।
* খাদ্যদ্রব্য সবর্দা ঢেকে রাখবেন।
* রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হলে, সেই রক্ত হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসমুক্ত কি না তা অবশ্যই পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।
* ভাইরাল হেপাটাইটিস সন্দেহ হলে সংগে-সংগে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।
* ইনজেক্শনের প্রয়োজন হলে একবার ব্যবহারযোগ্য (Disposable) সুঁচ এবং সিরিঞ্জ ব্যবহার করবেন।

(২য় পৃঃ দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্য কুইজ-১৬

১. প্রসব-পরবর্তী মাকে কী কী পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন?

২. যক্ষায় আক্রান্ত মা কি তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে?

৩. কী কী লক্ষণ থাকলে ১টি শিশুকে নিউমোনিয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে?

৪. বাড়িতে নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসবের জন্য একজন গর্ভবতী মাকে কী কী বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন?

৫. গর্ভবতী মায়ের আয়রনসমৃদ্ধ খাবার বেশি খাওয়া প্রয়োজন কেন?

(উত্তর আমাদের কাছে ১০ জুলাই ১৯৯৬ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ-১৫-এর উত্তর

১. মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে সোয়া তিন লক্ষ গর্ভবতী মহিলা ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত কারণে রাতকানা রোগে ভোগে।

২. ইউনিসেফ-এর তথ্যানুযায়ী প্রায় শতকরা ১০ ভাগ।

৩. মাংসে প্রোটিন উপাদান কমে যায় (সূত্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট)।

৪. হেপাটাইটিস রোগ ছড়াতে পারে :

— সংক্রামিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে

— আক্রান্ত ব্যক্তির যৌনমিলনের মাধ্যমে

— সংক্রামিত ইনজেকশন সূচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে

— সংক্রমিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে

৫. স্বাভাবিক রক্তে কোলেস্টেরল-এর মাত্রা ১৫০-২০০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার

সব ধরনের চর্বিযুক্ত খাবার, যেমন খাশির ও গরুর কলিজা, দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী, চকলেট, ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়।

(স্বাস্থ্য কুইজ—১৫ এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মজিবুর রহমান, ডাঃ তানজিনা মির্জা, ডাঃ শামীম এ. খান, ডাঃ অমল মিত্র ও শামীম আরা জাহান; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী; **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বিজে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ